ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩. বিভ্রান্তির তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৩. ৬. ২. ইসলামী শরীয়তে জিহাদ ও তার পূর্বশর্ত

‘জিহাদ’ অর্থ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম, পরিশ্রম ইত্যাদি।[1] আল্লাহর বিধান পালনের ও প্রচারের সকল শ্রম বা প্রচেষ্টাকেই কুরআন ও হাদীসে কখনো কখনো ‘জিহাদ’ বলা হয়েছে। যেমন, কাফির-মুনাফিকদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদকে জিহাদ বলা হয়েছে।[2] যালিম শাসকের সামনে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[3] হজ্জকে জিহাদ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে।[4] আল্লাহর আনুগত্য-মূলক বা আত্মশুদ্ধিমূলক যে কোনো কর্মের চেষ্টাকে জিহাদ বলা হয়েছে।[5] তবে ইসলামী পরিভাষায় ও ইসলামী ফিক্হে জিহাদ বলতে “কিতাল” বা মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকেই বুঝানো হয়। ফিকহের পরিভাষায় সর্বদা জিহাদ অর্থ কিতাল বলা হয়েছে।[6]

কতল অর্থ হত্যা করা। আর কিতাল অর্থ পরস্পরে যুদ্ধ। এজন্য জিহাদ বা কিতালের মূল শর্ত হলো সামনাসামনি ‘যুদ্ধ’। পিছন থেকে হত্যা করা, না জানিয়ে হত্যা করা, গুপ্ত হত্যা করা এগুলি কখনোই ইসলামী কিতাল বা জিহাদ নয়। মদীনার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নেতৃত্বে মুসলিমগণ অনেক ‘কিতাল’ করেছেন। যুদ্ধের ময়দান ছাড়া কাফিরদের দেশে যেয়ে গোপনে হত্যা, সন্ত্রাস, অগ্নি সংযোগ, বিষ প্রয়োগ ইত্যাদি কখনোই তিনি করেননি বা করার অনুমতি প্রদান করেননি। দুই-একটি ক্ষেত্রে যুদ্ধরত সামরিক নেতা বা মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীকে যথাসম্ভব কম রক্তপাতে মৃত্যুদন্ড প্রদানের জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে গোপন “কমান্ডো” অভিযান পারিচালনা করার অনুমতি দেন তিনি। কাব ইবনু আশরাফ ও আবূ রাফি সালাম ইবনু আবিল হুকাইক-এর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করতে কমান্ডো অভিযান ছিল এ পর্যায়ের। এরূপ অভিযানের মাধ্যমে তিনি মুসলিম বাহিনী ও শত্রু বাহিনী উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা প্রায় শূন্যে আনতে সক্ষম হয়েছেন।[7] রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত এরূপ কমান্ডো হামলা ছাড়া অন্য কোনোভাবে যুদ্ধের ময়দান ও বিচার ছাড়া তিনি হত্যার অনুমতি দেন নি। এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও অযোদ্ধাকে আঘাত করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

কিতাল বা যুদ্ধের ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক শর্ত আরোপ করেছে। সেগুলির অন্যতম (১) রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি, (২) রাষ্ট্র বা মুসলিমদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়া, (৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগকে প্রাধান্য দেওয়া ও (৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা।

(১) রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন

ইসলামে জিহাদের বৈধতার সর্বপ্রথম শর্ত হলো রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। কিতাল বা জিহাদ কখনোই ইসলামী রাষ্ট্র বা ইসলামী বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যম নয়। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম ‘দা‘ওয়াত’ বা প্রচার। কিতাল হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তার মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাওয়াতের মাধ্যমে

ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। দাওয়াতের বিরুদ্ধে অমানবিক বর্বরতা ও সহিংস প্রতিরোধকে তিনি পরিপূর্ণ অহিংস উত্তম আচরণ দিয়ে মুকাবিলা করেছেন। আবূ বাকর, উমার, উসমান, আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ ও মক্কার আরো অনেক শীর্ষস্থানীয় সামাজিক নেতা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাদের সাথে সাধারণ অনেক মুসলিম ছিলেন। তাঁরা সর্বদা রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর কাছে অনুমতি চেয়েছেন কাফিরদের সহিংস আচরণকে প্রতিরোধ করতে বা তাদের বর্বরতার প্রতিবাদে অস্ত্র তুলে নিতে। কিন্তু কখনোই সে অনুমতি দেওয়া হয় নি। এক পর্যায়ে দাওয়াতের ভিত্তিতে মদীনার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে তাঁদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে গ্রহণ করেন। এভাবে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুশরিকগণ এ নতুন রাষ্ট্রটিকে অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চেষ্টা করে। তখন রাষ্ট্র ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিধান প্রদান করা হয়। রাষ্ট্রের বিদ্যমানতা ও রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি বা নির্দেশ জিহাদের বৈধতার শর্ত বলে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন:

إنما الإمامُ جُنةٌ . يُقاتلُ من ورائهِ

“রাষ্টপ্রধান ঢাল, যাকে সামনে রেখে যুদ্ধ পরিচালিত হবে।”[৪]
এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে যুদ্ধ বা কিতালে লিপ্ত হন নি। আলী (রা)-এর সাথে মু‘আবিয়া (রা)-এর যুদ্ধ ছিল রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। ইয়াযিদের বিরুদ্ধে ইমাম হুসাইনের যুদ্ধ ও উমাইয়া শাসকদের সাথে আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের যুদ্ধ ছিল একান্তই রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ। মুআবিয়ার (রা) মৃত্যুর পরে কূফাবাসীগণ ইমাম হুসাইনকে (রা) রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাইয়াত করে পত্র লিখেন। তারা ইমাম হুসাইনকেই বৈধ রাষ্ট্রপতি হিসেবে গ্রহণ করেন এবং ইয়াযিদের রাষ্ট্রক্ষমতার দাবি অস্বীকার করেন। এভাবে মুসলিম সমাজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইরের (রা) ক্ষেত্রেও বিষয়টি একইরূপ ছিল। এ সকল বৈধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধও যেহেতু মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হতো, সেজন্য সাহাবীগণ সাধারণত এগুলিতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন, যদিও তাঁরা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক বিদ্রোহী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বৈধতা স্বীকার করতেন। আমরা দেখেছি যে, আলী (রা)-এর সময়ের যুদ্ধে ৩০ জনেরও কম সাহাবী অংশ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রসিদ্ধ তাবিয়ী ইবনু সিরীন, যদিও তখন হাজার হাজার সাহাবী জীবিত ছিলেন। ৭৩ হিজরীতে হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ যখন মক্কা অবরোধ করে ইবনু যুবাইরের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক আক্রমন চালাতে থাকে, তখন দুই ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা)-এর নিকট এসে বলে,

إنَّ الناسَ ضَيَّعوا وأنتَ ابنُ عُمَرَ، وصاحبُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فما يَمنَعُكَ أن تَخرُجَ ؟ فقال : يَمنَعُني أنَّ الله حَرَّمَ دمَ أخي

وفي رواية: ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل وقد علمت ما رغب الله فيه قال يا ابن أخي بني الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت

মানুষেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আপনি ইবনু উমার, রাসুলুল্লাহ (ﷺ)এর সাহাবী, আপনাকে বেরিয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে

বাধা দিচ্ছে কিসে? তিনি বলেন, "আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন, এ-ই আমাকে যুদ্ধে অংশ নিতে বাধা দিচ্ছে।" অন্য বর্ণনায় তারা বলে, "কি কারণে আপনি এক বছর হজ্জ করেন আরেক বছর উমরা করেন এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ পরিত্যাগ করেন? অথচ আপনি জানেন যে, আল্লাহ জিহাদের জন্য কী পরিমাণ উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছেন?" তখন আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, "ভাতিজা, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাঁচটি বিষয়ের উপর: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (ﷺ) উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রামাযানের সিয়াম, যাকাত প্রদান ও বাইতুল্লাহর হজ্জ।"[9]

এখানে আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) জিহাদের আদেশ ও হত্যার নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তুলনা করছেন। ইসলামের মূলনীতি, আদেশ পালনের চেয়ে নিষেধ বর্জন অগ্রগণ্য।[10] বিশেষত এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ কর্মটি কুরআন-হাদীসে বারংবার ভয়ঙ্করতম কবীরা গোনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া জিহাদ আরকানে ইসলামের মত মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বা উদ্দিষ্ট (Aimed at; intended) ইবাদত নয়; বরং তা উদ্দিষ্ট ইবাদতগুলি পালনের উপকরণ (accessory; equipment; apparatus) মাত্র। জিহাদের মাধ্যমে মূল ইবাদগুলি পালনের পরিবেশ রক্ষা করা হয়। পরিবেশ বিদ্যমান থাকলে আর জিহাদের প্রয়োজন থাকে না। উদ্দিষ্ট ইবাদত কখনো স্থগিত হয় না; উপকরণ স্থগিত হতে পারে। সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত সর্বদা সর্বাবস্থায় পালনীয়। পক্ষান্তরে "জিহাদ" কেবলমাত্র এ সকল ইবাদত পালনের বিঘ্ন ঘটলেই পালনীয়। সালাত, সিয়াম, তিলাওয়াত, যিক্র ইত্যাদি কর্ম সরাসরি ইবাদত। মুমিন যত বেশি পালন করবেন ততবেশি সাওয়াব লাভ করবেন। পক্ষান্তরে জিহাদ হলো অপরাধীর শাস্তি দেওয়ার মত ইবাদত। এক্ষেত্রে যত বেশি অপরাধীর শাস্তি দেওয়া হবে তত বেশি সাওয়াব হবে বলে মনে করার কোনো সুযোগ নেই। যদি অপরাধ প্রমাণিত হয় তাহলে শরীয়ত অনুসারে শাস্তি প্রদান ইবাদত বা দায়িত্বে পরিণত হয়। এজন্য ইসলামে শাস্তি প্রদান প্রক্রিয়া কঠিন করা হয়েছে এবং সামান্যতম সন্দেহের ক্ষেত্রে শাস্তিপ্রদান থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর এজন্যই জিহাদ এড়ানোর জন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা পরবর্তী অনুচ্ছেদে তা আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

এথেকে আমরা বুঝতে পারি যে, জিহাদ মূলত ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ ও ইসলামী দাওয়াতকে এগিয়ে নেওয়ার "উপকরণ"। প্রয়োজনে তা অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। তবে সর্বাবস্থায় চেষ্টা করতে হবে এ ব্যবস্থা এড়িয়ে সন্ধি বা শান্তির মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য সাধান করার। জিহাদের বারংবার আদেশ করা হলেও তার জন্য অনেক শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, তাকে ফরয আইন বলে কোথাও উল্লেখ করা হয় নি এবং তা পরিত্যাগের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই পরিত্যাগযোগ্য একটি কম পালনের জন্য মুমিন কখনোই ভয়ঙ্করতম একটি হারামে লিপ্ত হতে পারেন না। এক্ষেত্রে তাঁদের মূলনীতি ছিল যে, ভুল জিহাদের মানুষ হত্যা বা মানুষের ক্ষতি করার চেয়ে সঠিক জিহাদ বর্জন করা অনেক শ্রেয়।
এভাবে আমরা দেখি যে, সাহাবীগণ সন্দেহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বে বৈধ জিহাদেও অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন। আর রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের বাইরে কখনোই কোনো যুদ্ধ তারা বৈধ বলে মনে করেননি। খারিজীগণের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী বিষয়ক হাদীসগুলিতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) খারিজীদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি তিনি বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে পাবে তারা যেন তাদেরকে হত্যা করে।" সাহাবীগণ এ

থেকে কখনোই বুঝেন নি যে, খারিজীদেরকে পেলেই হত্যা করতে হবে। তাঁরা কখনোই যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যত্র কোনো সুপরিচিত খারিজী নেতাকেও হত্যা করেননি।[11]

(২) রাষ্ট্র বা মুসলিমের নিরাপত্তা

কিতালের অন্যতম শর্ত, শত্রুপক্ষ রাষ্ট্র আক্রমণ করবে বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে। মহান আল্লাহ বলেন:

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে।"[12]

মুসলিম রাষ্ট্রের ও নাগরিকগণের নিরাপত্তা ছাড়াও অন্যদেশের নির্যাতিত মুসলিম নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতার হাত বাড়ানো মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও জিহাদের প্রয়োজনে হতে পারে। যদি অন্য দেশের মুসলিম নাগরিকগণ কোনো মুসলিম দেশের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সে দেশের সাথে মুসলিম দেশের কোনো চুক্তি বা কূটনৈতিক সম্পর্ক না থাকে তাহলে মুসলিম রাষ্ট্র প্রয়োজনে সে দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে বা তাদেরকে নির্যাতন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে পারে। আল্লাহ বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

"নিশ্চয় যারা ঈমন এনছে, হিজরত করেছে (অমুসলিম সমাজ পরিত্যাগ করে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে) এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে তারা একে অপরের অভিভাবক-বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে, কিন্তু হিজরত করেনি, তাদের অভিভাবকত্বের (সাহায্যের) কোনোরূপ দায়িত্ব তোমাদের নেই, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে। আর যদি তারা দীনের বিষয়ে তোমাদের নিকট কোনো সাহায্য চায় তবে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। তবে এরূপ জাতির বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের পারস্পরিক চুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ পূর্ণ দৃষ্টিমান।"[13]

(৩) সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ

আমরা দেখেছি যে, জিহাদ উদ্দিষ্ট ইবাদত নয়, উদ্দিষ্ট ইবাদত পালনের পরিবেশ রক্ষার উপকরণ। জিহাদের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র, নাগরিক ও ইসলামী দাওয়াতের নিরাপত্তা রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য যদি জিহাদ ছাড়া অর্জিত হয় তবে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য ইসলামে সন্ধি ও শান্তির সুযোগ গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"আর যদি তারা সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও তার প্রতি ঝুঁকে পড়, আর আল্লাহর উপর নির্ভর কর, নিশ্চয়

তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[14] হুদাইবিয়ার সন্ধির ঘটনা কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে আমরা দেখি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সংরক্ষণ, দাওয়াতের প্রসার ও দীনের বিজয়ে জিহাদের চেয়েও সন্ধির অবদান ছিল অনেক বেশি। জাগতিক বিচারে এ সন্ধি ছিল অপমানজনক, অবমাননাকর এবং কাফিরদেরকে সকল ছাড় দেওয়া। যে কোনো আবেগী বিচারে এ ছিল "সব কিছু মেনে নেওয়া"। উমার (রা) ও অধিকাংশ সাহাবীই এরূপ ভেবেছেন। এ সময়ে মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সকল অধিকার তাদের ছিল এবং যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সকল সুযোগ ও সম্ভাবনাও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কাফিরদের সকল দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি করেছেন। আর ইসলামের কোনো জিহাদ, গাযওয়া, যুদ্ধ, অভিযান বা বিজয়কে "ফাতহ মুবীন" বা সুস্পষ্ট বিজয় বলা হয় নি। কিন্তু এ "সব কিছু মেনে নেওয়ার" সন্ধিকে কুরআনে "ফাতহ মুবীন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সন্ধি ও শান্তি রক্ষায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এর একটি প্রকাশ হুদায়বিয়ার সন্ধি রক্ষার্থে নির্যাতিত মুসলিমদেরকে কাফিরদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এ ছিল এমন একটি সিদ্ধান্ত যা প্রায় সকল সাহাবীকে বিক্ষুব্ধ করেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ চুক্তি রক্ষায় অনড় ছিলেন। সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরের সময়ে হুদাইবিয়ার ময়দানেই আবূ জানদাল (রা) নামক একজন নির্যাতিত মুসলিম শৃঙ্খলিত অবস্থাতেই মক্কা থেকে পালিয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) শর্ত মেতাবেক তাকে মক্কাবাসীদের হাতে সমর্পন করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ এ বিষয়ে খুবই আবেগী হয়ে উঠেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। এরপর আরেক নির্যাতিত মুসলিম আবূ বাসীর (রা) মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় প্রার্থনা করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকেও ফিরিয়ে দেন। একপর্যায়ে আবূ বাসীর (রা), আবূ জানদাল (রা) ও আরো অনেক নির্যাতিত মুসলিম মক্কা থেকে পালিয়ে সিরিয়ার পথে 'ঈস' নামক স্থানে সমবেত হন। সন্ধিচুক্তির কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদেরকে মদীনার নাগরিক হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন নি। আর মদীনা রাষ্টের সাথে মক্কাবাসীদের সন্ধি থাকলেও এ নতুন জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সন্ধি ছিল না; বরং তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছি। এ অবস্থায় তাঁরা সিরিয়াগামী কুরাইশ কাফিলাগুলির উপর আক্রমন চালাতে থাকেন। মক্কাবাসীরা বুঝতে পারে যে, এদেরকে মদীনা রাষ্টের নাগরিক মেনে সন্ধিচুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাই তাদের জন্য নিরাপদ। তাদেরই অনুরোধে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধিচুক্তির সংশিষ্ট শর্তটি বাতিল করে তাঁদেরকে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণের ব্যবস্থা করেন।[15]

এভাবে সকল প্রকার আবেগ ও বেদনা নিয়ন্ত্রণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সন্ধি ও শান্তি রক্ষার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধ বা হত্যা এড়িয়ে শান্তির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইসলামে রাষ্ট্রীয় যুদ্ধের ক্ষেত্রেও যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শান্তির সুযোগ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শত্রুবাহিনীকে সন্ধি, আত্মসমর্পন, ইসলাম গ্রহণ, জিযিয়া বা কর প্রদান ইত্যাদির সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে, যুদ্ধ চলাকালে একেবারে অস্ত্রাঘাতের সময়ও যদি কোনো শত্রু সৈন্য নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তবে তাকে আর আঘাত করা যাবে না। বস্তুত একজন ডাক্তার যেমন সর্বাত্মক চেষ্টা করেন রোগীর অঙ্গচ্ছেদ না করে চিকিৎসা করারএকান্ত বাধ্য হলেই কেবল তার কোনো অঙ্গ কেটে প্রাণ বাচানোর চেষ্টা করেন; তেমনি ইসলামে সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে প্রতিটি মানুষের প্রাণ রক্ষা করার।

(৪) কেবলমাত্র যোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত

কিতালের অন্য শর্ত, শুধু যারা যুদ্ধ করতে অস্ত্রধারণ করে সামনে এসেছে তাদেরই সাথে যুদ্ধ করতে হবে।

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“তোমরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ কর তাদের সাথে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করছে। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করবে না, আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।”[16] এ নির্দেশের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও যুদ্ধের নামে অযোদ্ধা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা, অযোদ্ধা মানুষদেরকে হত্যা করা ইত্যাদি সন্ত্রাসের পথ রোধ করেছে। যোদ্ধা ছাড়া কারো সাথে যুদ্ধ করা যাবে না এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রেও সীমালঙ্ঘন, আগ্রাসন ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে হাদীসের নির্দেশ:

لا تغدروا ولا تمثلواولا تقتلوا وليداً ولا اصحاب الصوامع ... ولا راهبا ... ولا امرأةً ولا شيخاً كبيراً ... ولا تذبحوا بغيراً ولا بقرةً الا لمأكل ... ولا تخربوا عمراناً ولا تقطعوا شجرة الا لنفع ...وأحسنوا ان الله يحب المحسنين

“যুদ্ধে তোমরা প্রতারণা বা ধোঁকার আশ্রয় নেবে না, চুক্তিভঙ্গ করবে না, কোনো মানুষ বা প্রাণীর মৃতদেহ বিকৃত করবে না বা অসম্মান করবে না, কোনো শিশু-কিশোরকে হত্যা করবে না, কোনো মহিলাকে হত্যা করবে না, কোনো গীর্জাবাসী, সন্ন্যাসী বা ধর্মযাজককে হত্যা করবে না, কোনো বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোনো অসুস্থ মানুষকে হত্যা করবে না, কোনো বাড়িঘর ধ্বংস করবে না, খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া গরু, উট বা কোনো প্রাণী বধ করবে না, যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া কোনো গাছ কাটবে না...। তোমরা দয়া ও কল্যাণ করবে, কারণ আল্লাহ দয়াকারী- কল্যাণকারীদেরকে ভালবাসেন।[17]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন যথাসম্ভব কম প্রাণহানি ঘটাতে। শুধু মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিক ও যোদ্ধাদের জীবনই নয়, উপরন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক ও যোদ্ধাদেরও প্রাণহানি কমাতে চেয়েছেন। বস্তুত ইসলাম যুদ্ধকে যে মানবিক রূপ প্রদান করেছে তা অন্য কোনো ধর্মেই পাওয়া যায় না। উপর্যুক্ত শর্তাবলির বিদ্যমানতায় জিহাদ শরীয়ত সম্মত ইবাদতে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে জিহাদ আত্মরক্ষামূলক (defensive) হতে পারে। আবার তা আক্রমনাত্মক বা নিবৃত্তিমূলক (offensive/preemptive) হতে পারে। রাষ্ট্র প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

ফুটনোট

[1] কুরতুবী, আল-জামি’ লি আহকামিল কুরআন ৩/৫০/

[2] সূরা তাওবা, ৭৩ আয়াত, সূরা ফুরকান, ৫২ আয়াত, সূরা তাহরীম ৯ আয়াত। তাবারী, জামিউল বায়ান ১০/১৮৩। কুরতুবী, আল-জামি’ ১৩/৫৮।

[3] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/৪৭১; আবু দাউদ, আস-সুনান ৪/১২৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৪/৫৫১।

[4] বুখারী, আস-সহীহ ২/৫৫৩, ৩/১০২৬।

[5] তিরমিযী, আস-সুনান ৪/১৬৫; ইবনু হিব্বান, আস-সহীহ ১১/২০৪; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ১/৫৪।

[6] ইবনু হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী ৬/৩; যারকানী মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল বাকী (১১২২ হি.), শরহুল

মুয়াত্তা ৩/৩; আযীমআবাদী, মুহাম্মাদ শামসুল হক্ক, আওনুল মা’বুদ ৭/১১১; মুনাবী, আব্দুর রাউফ (১০৩১ হি.), ফাইদুল কাদীর ২/৩০; সানআনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (৮৫২ হি.), সুবুলুস সালাম ৪/৪১; শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু আলী (১২৫৫ হি.), নাইলুল আওতার ৮/২৫।

[7] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৪৮১-১৪৮২; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪২৫।

[8] বুখারী, আস-সহীহ ৩/১০৮০; মুসলিম, আস-সহীহ ৩/১৪৭১।

[9] বুখারী, আস-সহীহ ৪/১৬৪১; ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী ৮/১৮৪, ৩১০।

[10] বুখারী, আস-সহীহ ৬/২৬৫৮; মুসলিম, আস-সহীহ ৪/১৮৩০।

[11] ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওারিজ, পৃ. ৪৭-৫৭।

[12] সূরা (২২) হজ্জ, আয়াত ৩৯।

[13] সূরা (৮) আনফাল: আয়াত ৭২।

[14] সূরা (৮) আনফাল: আয়াত ৬১।

[15] বুখারী, আস-সহীহ ২/৯৭৯; হাকিম, আল-মুসতাদরাক ৩/৩১১-৩১২।

[16] সূরা (২) বাকরা: আয়াত ১৯০।

[17] বাইহাকী, আহমাদ ইবনুল হুসাইন (৪৫৮ হি.), আস-সুনানুল কুবরা ৯/৯০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6908

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন